অমোঘ

সায়ন্তনী পূততুন্ড

https://boierpathshala.blogspot.com

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না,
শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com

অমোঘ

সায়ন্তনী পূততুন্ড

পরির চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়ছিল। পরিটার বয়স হয়েছে। বহু বছর ধরে

সে পাথরের ফোয়ারার মাঝখানে পাখা গুটিয়ে দাঁড়িয়ে জল ঢেলেই চলেছে। তারুণ্যের পেলবতা হারিয়ে সে এখন রংচটা, বিবর্ণ ধ্বংসস্তূপ মাত্র। আজ দেখলে ওকে পরি বলে চেনাই যায় না। তবু অজয় জানে, ও আসলে পরিই। হাতের কলসি থেকে এখনও যেটুকু তিরতিরে জলের রেখা গড়িয়ে পড়ে তা আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প হলেও, আসলে অসীম! এ জলের ধারা শীর্ণ হতে পারে, শেষ হতে পারে না। আজ ভোর থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভোরের হালকা গোলাপি, মোমের মতো পেলব আলোয় ওকে ভিজতে দেখে হঠাৎ মনে হল—কোনওদিন বুঝি ঠিকভাবে দেখা হয়নি। শৈশবে ওর চতুর্দিকে দৌড়ে দৌড়ে কত খেলেছে, কৈশোরে, যৌবনে পাশ দিয়ে কতবার হেঁটে গেছে। কই, কখনও তো ফিরে তাকায়নি তো সেদিকে! এতটাই অমোঘ ছিল তার অস্তিত্ব যে তাকানোর দরকারই পড়েনি! অজয় যতই মুখ ফিরিয়ে থাক, মনে মনে জানত সে যথাস্থানেই আছে। একদৃষ্টে পরিটার দিকে তাকিয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়েছিল সে। আচমকা একটা মৃদু পায়ের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল। একমাস ধরে প্রতিরাতে এই পায়ের আওয়াজ শুনছে। প্রতি দু'-এক ঘণ্টা অন্তর পদশব্দ জাগ্রত হয়। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে মায়ের ঘরের দরজার সামনে। কিছুক্ষণ নীরবতা। পায়ের মালিক উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করে। তারপরই আওয়াজটা এগিয়ে আসবে অজয়ের ঘরের দিকে। শোনা যাবে একটা কুণ্ঠিত স্বর...।

"বাবু, জেগে আছিস।"

অজয় তাড়াতাড়ি উঠে যায় দরজার সামনে। এক অসহায় বৃদ্ধ ভয় আর উদ্বেগ মিশিয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

"হ্যাঁ বাবা।"

"একবার এদিকে আসবি?"

সে জানে এরপর ঠিক কী হবে। বাবা তাকে মায়ের ঘরের সামনে নিয়ে যাবেন। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে বলবেন, "শব্দটা শুনতে পাচ্ছিস?"

মায়ের ঘরে এখন নাইটের নার্স উপস্থিত। এই পরিস্থিতিতে ভোররাতে দু'জন পুরুষের ও ঘরে প্রবেশ সমীচীন নয়। তাই বাধ্য হয়ে দরজায় কান ঠেকায় অজয়। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে! ক্ষীণ---কিন্তু অস্ফুট ঘড়ঘড় শব্দটা শুনতে অসুবিধে হচ্ছে না।

"কি রে, শোনা যাচ্ছে না!" বাবা অধৈর্য।

"হ্যাঁ বাবা, শোনা যাচ্ছে।"

"শোনা যাচ্ছে?" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে। তুই যা। একটু ঘুমিয়ে নে।"

বাবা আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। অজয় নিজের ঘরে ফিরে এল। কিন্তু ঘুমোনোর চেষ্টাও করল না। সে জানে ঠিক একঘণ্টা পরেই বাবা ফের দাঁড়াবেন মায়ের দরজার সামনে। কিছুক্ষণ বাদেই আবার শোনা যাবে তাঁর সঙ্কুচিত কণ্ঠস্বর—"বাবু, জেগে আছিস?"

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন দিব্যেন্দু নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বীণাপাণির বিয়ের কথা চলছিল, তখন দিব্যেন্দুর বাবা মেয়ে দেখেই এমন মোহিত হয়েছিলেন যে দেনাপাওনার প্রসঙ্গই তোলেননি। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা মেয়ে, পিঠ ছাপানো কালো কুচকুচে চুল, পটুয়ার তুলিতে আঁকা চোখ মুখ—সব মিলিয়ে নিখুঁত হৈমবতী! বীণার বাবা কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী পেশায় পোস্টমাস্টার ছিলেন। মা ষষ্ঠীর কৃপায় চার-চারটি মেয়ের দায়গ্রস্ত

https://boierpathshala.blogspot.com

আমি ঘর করতে পারব না। এক্ষুনি ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

পূর্ণেন্দু তখন লাইব্রেরিতে বসে আইনের বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কীভাবে প্রমাণিত হল যে বউমা অলুক্ষুণে।"

"কাল আমি দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি।" তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

"তাতে বউমার কী দোষ?" পূর্ণেন্দু ঠান্ডা স্বরে বলেন, "তোমার বয়স হয়েছে। এই বয়সে অনিদ্রা হতেই পারে। অথবা সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর গরম হতে পারে, কিংবা ছারপোকাও কামড়াতে পারে। ঘুম না হওয়ার আরও অন্তত একশো একাত্তরটা কারণ আছে, এর মধ্যে বউমা আসছে কোথা থেকে?"

নারায়ণী দাঁত কিড়মিড় করতে করতে তার অনিদ্রার কারণ বিস্তারিত বললেন। সব শুনে পূর্ণেন্দু হেসে ফেলেছেন, "যাক, তবে অবশেষে তোমার একজন জাঁদরেল প্রতিদ্বন্দ্বী এল। এতদিন যৌতুকে পাওয়া কামানের বিরুদ্ধে আমি একাই লড়ে গেছি। এখন দেখছি, দিবুটাও কামান নিয়ে এসেছে। তুমিও যখন ঘুমোতে পারোনি,

পিতা। দিব্যেন্দুর বাবা পূর্ণেন্দুনারায়ণ বংশমর্যাদায় ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক উপরতলার মানুষ। হাইকোর্টের নামজাদা উকিল। দিব্যেন্দু পড়াশোনায় চৌকস, উচ্চশিক্ষিত রূপবান যুবক। ভবিষ্যতে সেও উকিল হবে। এমন হিরের টুকরো নিম্নমধ্যবিত্ত পোস্টমাস্টারের হাতে আসে না। কিন্তু বীণার সৌভাগ্যে এসে পড়ল! পূর্ণেন্দুনারায়ণ গাড়িতে যেতে যেতে রাস্তায় অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হলেন। এবং ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যে এ মেয়ের সঙ্গেই একমাত্র ছেলের বিয়ে দেবেন। সোনা-গয়না-আসবাবপত্র গোল্লায় যাক—মেয়েকে যদি তার বাবা এক কাপড়েও বিদায় দেয়, তাতেও কোনও আপত্তি নেই। দিব্যেন্দুর মা নারায়ণী প্রথমে এ কথা শুনে গাল ফুলিয়েছিলেন। এ আবার কেমনতরো কথা! রূপ ধুয়ে কি জল খাবে! অমন কার্তিকের মতো সুন্দর ছেলে! শেষে তার বিয়ে হবে এক হাভাতে পোস্টমাস্টারের মেয়ের সঙ্গে! তত্ত্ব-তলাশ করা তো দূর, মেয়ের বাপ কুটোটিও ছোঁয়াতে পারবে না। কিন্তু সে আপত্তি ধোপে টিকল না। পূর্ণেন্দু জাঁদরেল পুরুষ ছিলেন। তার কথা প্রায় শিলালিপির সামিল। অগত্যা মুখ হাঁড়ি করেই ছেলের বউকে বরণ করে ঘরে তুললেন নারায়ণী।

শাড়ির খসখস, চুড়ির রিনরিন, পায়ের নূপুরের ছমছম—মানবী নয়, মূর্তিমতী কলাশ্রী রাগ তাকে মোহে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। দেহে মনে সেই রাগের অপূর্ব মূর্চ্ছনা টের পাচ্ছিলেন তিনি।

বউ দেখে সকলেই মুগ্ধ। একেবারে যেন দেবী প্রতিমা! দিব্যেন্দুর পাশে চমৎকার মানিয়েছে। অবিকল লক্ষ্মী-নারায়ণের জুটি।

দিব্যেন্দুও মনে মনে পুলকিত হচ্ছিলেন। লাল বেনারসিতে জড়ানো, চন্দনের টিপ পরা তাজা শিউলির মতো নারীটি সম্পূর্ণ তার একার সম্পত্তি, ভাবতেই বুকের ভিতরে অদ্ভুত শিহরন! তার শাড়ির খসখস, চুড়ির রিনরিন, পায়ের নূপুরের ছমছম—সব মিলিয়ে যেন মানবী নয়, মূর্তিমতী কলাশ্রী রাগ একটু একটু করে তাকে মোহে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। দেহে মনে সেই রাগের অপূর্ব মূর্চ্ছনা টের পাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চেয়েও উচ্চতর অঙ্গের আরও কিছু ছিল। সেটা প্রথমে টের পেলেন বীণার শাশুড়ি নারায়ণী। কালরাত্রির নিয়ম অনুযায়ী বউকে সঙ্গে নিয়ে শুয়েছিলেন। পরদিন সকালে নিদ্রাহীন আরক্ত চোখে পূর্ণেন্দুকে এসে বললেন, "এমন অলুক্ষুণে বউ নিয়ে

তখন এটা নির্ঘাত লর্ড ক্লাইভের তোপ।"

"মানে!" তিনি রেগে গিয়ে বললেন, "কী সব উষ্টুম-ধুষ্টুম বকছ! এর একটা বিহিত তোমাকে করতেই হবে?"

"কিসের বিহিত?" তিনি আরামকেদারায় এলিয়ে পড়েছেন, "এটা কোনও ক্রিমিনাল অফেন্স নয়। আইনের কোনও ধারাতেই রেফারেন্স নেই। অবশ্য দিবু যদি হার্টফেল করে তবে কেস হতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ না তা হচ্ছে, ততক্ষণ কিছু করার নেই।"

বলতে বলতেই মুচকি হাসলেন পূর্ণেন্দু, "আর এত রাগ করছ কেন? বংশানুক্রমে এ বাড়িতে সিংহবাহিনীর কৃপায় সিংহনাদিনী বউয়েরা এসে ঢুকেছে। এখনও সে বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ। তোমার গর্ব হওয়া উচিত।"

এরপর আর কিছু বলার থাকে না। গায়ের ঝালের সমস্তটাই হজম করল বেচারি রসি বামনি! তার রাঁধা শুক্তো, ডাল, মাছের ঝোল, অম্বল—কোনওটাই পছন্দ হয় না

boierpathshala.blogspot.com

গিন্নির। খালি গজগজ করে বেড়ান, "এ কী আমার গুষ্টির পিণ্ডি রেঁধেছিস।"
রসি বামনি তো আর ঘরের বউ নয় যে সব কথা চুপচাপ হজম করবে। এক খাবলা নস্যি মুখে গুঁজে সেও ট্যাকস ট্যাকস করে কথা শোনায়, "যখন কিছুই পছন্দ হয় না মা, তখন তুমি নিজেই রেঁধে নাও নে কেন?"
আরক্ত চোখ রাগে প্রায় লঙ্কাবাটা করে, অগ্নিদৃষ্টিতে রসি বামনিকে আধপোড়া করে দিয়ে চলে গেলেন শ্বশ্রূমাতা।
নতুন বউ তার ঘরে বসে সবই শুনতে পাচ্ছিল। তার তখন রীতিমতো কান্না পাচ্ছে। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে পারলে বোধহয় সে বাঁচত! বাপের বাড়িতে খাওয়া-পরার কষ্ট ছিল। প্রতি পদক্ষেপে ছিল দারিদ্রের চোখ রাঙানি! কিন্তু অভিযোগ ছিল না। কেউ তাকে কখনও অসুবিধের কারণ বলে চিহ্নিত করেনি। আঙুল তোলেনি। কিন্তু এখন এ লজ্জা সে কোথায় রাখবে? কুণ্ঠায়, লজ্জায়, আত্মগ্লানি ও অসহায়তায় বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল নিরাপত্তাহীন মেয়েটি। তার বেদনার কথা, লজ্জার কথা কাউকে বলা যায় না। কাউকে বোঝানো যায় না!

"মামা, জানো...।" দিব্যেন্দুর সাত বছরের ভাগনে তার কোলে উঠে বসে বক্তব্য রাখল, "দিদা বলছিল যে নতুন মামির নাকের ভিতরে নাকি সিংহ আছে। তুমি দেখেছ?"
সেদিন ফুলশয্যা। দিব্যেন্দু রোম্যান্সের আকাশে তখন উথালি পাথালি উড়ছেন। ভাগনের কথায় ধপাস করে এসে আছড়ে পড়লেন মাটিতে! না, ঠিক মাটিতেও নয়, বলা ভাল আটকে গেলেন বাবলা গাছে! অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন সাত বছরের বাচ্চাটার দিকে! বলে কী ছেলেটা!
"সিংহ!"
"হ্যাঁ... দিদা বলছিল যে রাতে নাকি সিংহটা ডাকে... আর...।"
"এই ফটিক...।"
ফটিক আরও কিছু তথ্য জানাবার আগেই তার মা পিছন থেকে এসে কান টেনে ধরেছে, "খুব পেকেছিস। তাই না?... যা এখান থেকে...।" কানের টানে ফটিকের মুখ বন্ধ হল বটে কিন্তু দিব্যেন্দু তখনও সংশয়ে।
অন্যদিকে মেয়েমহলে নারায়ণীর কৃপায় 'দিকে দিকে বার্তা রটি গেল ক্রমে।' নতুন বউয়ের কীর্তি মাসিমা, পিসিমা, কাকিমা-জেঠিমাদের জানতে আর বাকি নেই। দিব্যেন্দুর সামনে পড়লেই তারা মুখ টিপে মুচকি মুচকি হাসছেন। সে হাসির মধ্যে কতটা রহস্য আর কতটা 'এবার কালী তোমায় খাবো' গোছের ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে তা ঈশ্বরই জানেন। তার পক্ষে তখন জানা সম্ভব ছিল না। তবে জানতেও বেশি দেরি হল না।
বীণাপাণি শুধু সুন্দরীই নন, বড় মধুর স্বভাবের নারী। তার উপর মনে মনে স্বামীর প্রতি অগাধ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাও ছিল। জানতেন যে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন স্বামী নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের কপালে শুধু বরাতজোরেই জোটে। নিজের রূপ যৌবন সম্পর্কে যতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন, তার থেকেও পুরুষটির বিশালত্ব ও মহানতা সম্পর্কে তটস্থ ছিলেন বেশি। ফলস্বরূপ জীবনসঙ্গী হয়ে দাঁড়ালেন জীবনদেবতা, ফুলশয্যার রাতে যা হল তা নিছক মিলন নয়। নিবেদন।
দিব্যেন্দু লক্ষ করেছিলেন তার সদ্য

ভয়ঙ্কর শব্দে বিছানায় উঠে বসলেন তিনি! সে কি আওয়াজ! আওয়াজের বর্ণনা একটি শব্দে করা সম্ভব নয়।

পরিণীতা স্ত্রী যেন একটু সন্ত্রস্ত। টানা টানা চোখ দুটোয় এক অকথিত ভয় আর বিষণ্ণতা লুকিয়ে আছে। বেশ সঙ্কুচিত অপরাধী অপরাধী ভাব। যেন কি এক গর্হিত অপরাধ করে ফেলেছেন।
তিনি বিশেষ মাথা ঘামাননি। নতুন পরিবেশে, নতুন সংসারে, নতুন মানুষদের মধ্যে এসে পড়লে হয়তো সব মেয়েরাই একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকে। আস্তে আস্তে কেটে যাবে।
ফুলশয্যার মাধুর্য বুকে নিয়েই সে রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন দিব্যেন্দু। রসগোল্লা খাওয়ার পরেও মুখটা যেমন মিষ্টি হয়ে থাকে, তেমনই বীণাপাণির মাধুরী তাকে ঘুমের মধ্যেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। হঠাৎই ঘটল ইন্দ্রপতন! মধ্যরাতে একটা ভয়ঙ্কর শব্দে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন তিনি! সে কি আওয়াজ! সে আওয়াজের বর্ণনা একটি মাত্র শব্দে করা সম্ভব নয়। একসঙ্গে গোটা চারেক পেঁচোয় পাওয়া বাচ্চা যদি আকস্মিকভাবে কান্না জুড়ে দেয়, প্রায় এক ডজন ট্যাঙ্ক যদি গোলাগুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ধড়বড় করে এগিয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে পুরনো অস্টিন গাড়িটা জন জন শব্দে স্টার্ট নেয়, তবে সব ক'টাকে মিলিয়ে সেই শব্দ বিপ্লবের কিছুটা আন্দাজ করা যায়!
বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে তিনি দেখলেন, এই শব্দের মূল উৎস তারই নববধূ! অমন পদ্মফুলের মতো সুন্দরী মেয়েটা যে এমন প্রবল বিক্রমে নাক ডাকতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।
কাঁচাঘুম ভেঙে যাওয়ার প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে উঠে দিব্যেন্দু ভাবতে বসলেন কী করবেন! প্রথমে কানে মাথায় বালিশ চাপা দিয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করলেন। তাতেও যখন কাজ হল না তখন তুলোর খোঁজ শুরু করেন। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে তুলো কোথায় পাবেন! অগত্যা স্ত্রীকে একটা দুটো ঠ্যালাও মেরে দেখলেন। তিনি তখন ঘুমিয়ে কাদা! ধাক্কা খেয়ে নাক ডাকার আওয়াজ মন্দ্রসপ্তক ছেড়ে তার সপ্তকে চড়ল বই কমল না!
নিদ্রাহীন হিংস্রতায় তার মাথায় বীণার নাক সবলে টিপে ধরার আইডিয়াও এল। কিন্তু অভিজাত ভদ্রসন্তানের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই শেষপর্যন্ত 'ধুত্তোর' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। চতুর্দিক তখন শুনশান। সবাই যে যার নিজের ঘরে ঘুমে অচেতন। দিব্যেন্দু আর কী করেন! কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে মশার কামড় খেলেন। বাগানের ফোয়ারায় শ্বেতপাথরের পরিটার দিকে তাকিয়ে সময় কাটালেন। ওদিকে ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে। বারান্দার একপাশে একটা কাঠের বেঞ্চ ছিল। ভূতো চাকরটা রোজ ওখানেই ঘুমোয়। আজ বোধহয় অন্য কোথাও শুয়েছে। তাই বেঞ্চটা ফাঁকা। উপায়ান্তর না দেখে সেখানেই শুয়ে পড়লেন তিনি। এবং দেখতে দেখতেই ঘুমিয়েও পড়লেন। মশাগুলো কানের কাছে অনেকক্ষণ ভনভন পনপন করেও যখন দেখল লোকটার ঘুম ভাঙার সম্ভাবনা নেই, তখন মহানন্দে ফিষ্টি করতে

boierpathshala.blogspot.com

বসে গেল।
পরদিন সকালে ছেলের দুর্গতি দেখে হাউমাউ করে উঠলেন নারায়ণী। উদভ্রান্তের মতো বাসি কাপড় না ছেড়েই দৌড়লেন কর্তার কাছে।
"কোন চাঁড়ালের ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে এসেছ! দিবুকে মেরে ফেলল যে!"
গিন্নির উগ্রচণ্ডালি মূর্তি আড়চোখে দেখলেন পূর্ণেন্দু, "কখন ও কীভাবে মেরে ফেলেছে? অস্ত্র কী? সাক্ষী কে?"
নারায়ণী 'থ'! বাপ হয়ে ছেলে সম্পর্কে কেউ একথা বলতে পারে তা তার ধারণার বাইরে। কোনওমতে চোখের জল সামলাতে সামলাতে বললেন, "বাপ হয়ে এমন অলুক্ষণে কথা বলতে পারলে! অমন একটা নাক থাকতে অন্য কিছুর দরকার কী? সারারাত ছেলেটা বারান্দায় বেঞ্চিতে শুয়েছিল। এমন বউ এনেছ যে ছাতের তলায় শোওয়ার সুখও জুটল না দিবুর। সারারাত খালি মশার কামড় খেয়েছে...।'
"বাঘের কামড় তো খায়নি!" পূর্ণেন্দু হাতের বইটা টেবিলের উপরে রেখে উঠে দাঁড়ালেন, "চলো, দেখছি।"
বেঞ্চের চতুর্দিকে তখন রীতিমতো ভিড়। ফুলশয্যার দিন বর যুবতী বউকে ছেড়ে বারান্দার বেঞ্চে এসে ঘুমোচ্ছে, এমন মুখরোচক কেচ্ছা ও কেলেঙ্কারি পেলে কেউ সহজে ছাড়ে না। বাইরে অপ্রস্তুত দিব্যেন্দু। ঘরের দরজা ভেজানো। ভিতরে তখন মূল অপরাধী মুখ চুন করে বসে আছে। তার মুখ রক্তশূন্য।
পূর্ণেন্দু চতুর্দিকটা একবার ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার সঙ্গে এসো।"
বাবার কথা অমান্য করার উপায় নেই। বিনাবাক্যব্যয়ে তার পিছন পিছন সুড়সুড় করে চললেন তিনি। লাইব্রেরি ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন পূর্ণেন্দু। ছেলেকে বললেন, "বোসো।"
দিব্যেন্দু বসলেন। ভীরু চোখে বাবার মেজাজ মেপে নিচ্ছেন। বাবা আদৌ কড়া মেজাজের লোক নন। বরং অসম্ভব ঠান্ডা মাথার মানুষ। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বকে সবাই সমীহ করে চলে।
"দিবু।" খুব হালকাভাবেই বললেন তিনি, "ছোটবেলায় তোমার ঘুমের মধ্যে হাত-পা চালানোর অভ্যেস ছিল। মনে আছে?"
দিব্যেন্দু মাথা নাড়লেন। তার মনে আছে।
"একবার লাথি মেরে তোমার মাকে বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছিলে। আর একবার ঘুঁষি মেরে আমার নাকটাই জখম করার উপক্রম করেছিলে।" পূর্ণেন্দু একটু থামলেন, "তার জন্য তোমাকে ফেলে, বিছানা ছেড়ে উঠে অন্য ঘরে চলে যাইনি। তোমার খারাপ শোওয়ার অভ্যেসটাকেই মেনে নিয়েছিলাম। তাই না?"
"কিন্তু বাবা...।"
"দাঁড়াও। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।" বাবা বললেন, "এখনও তোমার সে অভ্যেস যায়নি। যেহেতু তুমি বড় হয়েছ এবং আলাদা ঘরে ঘুমাও, সেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। কিন্তু তোমার বালিশ আর বিছানার যা অবস্থা হয়, সেই সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স দেখেই বোঝা যায় বদ অভ্যাসটা এখনও আছে। আর আমি যদি ভুল না করি, তবে তোমার স্ত্রী'ও কাল রাত্রে অন্তত ন্যূনতম একটা গুঁতো বা লাথি হজম করেছে। সেই মেয়েটি কি তোমাকে ফেলে বাইরে চলে এসেছে? তোমায় নিয়ে কাউকে ঠাট্টা বা মশকরা করার সুযোগ দিয়েছে?" একটু থেমে সামান্য বিরতি টেনে ফের বললেন তিনি, "তবে তুমি তাকে সবার সামনে হাস্যাস্পদ করে তুলছ কেন?"

> মানুষ কখনও নিখুঁত হয় না দিবু। তুমিও নিখুঁত নও। কিন্তু তুমি পুরুষ—তাই তোমার স্ত্রী সেই ত্রুটিটুকু মেনে নেবে। তোমার সম্মানরক্ষার্থে সে গুঁতো, ঘুষি, লাথি চুপচাপ হজম করবে।

দিব্যেন্দু এ কথার কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না।
"মানুষ কখনও নিখুঁত হয় না দিবু। তুমিও নিখুঁত নও। কিন্তু যেহেতু তুমি পুরুষ—তাই তোমার স্ত্রী সেই ত্রুটিটুকু সহজেই মেনে নেবে। তোমার সম্মানরক্ষার্থে সে গুঁতো, ঘুষি, লাথি চুপচাপ হজম করবে। মেয়েদের সেই সুবিধা নেই। তাদের অনেক কটূক্তি সহ্য করতে হয়।" তাঁর আঙুল দিব্যেন্দুর দিকে উঠল, "স্বামী হয়ে স্ত্রীর সম্মান যদি না রক্ষা করতে পার, তবে তুমি কিসের পুরুষ? তোমার স্ত্রী যা পারে, যদি সেটুকুও না পার তবে স্বামী হওয়ার যোগ্যতাই তোমার নেই। সম্পর্কের দায় দু'জনেরই। একা মেয়েটির নয়। বুঝেছ?"
দিব্যেন্দু বুঝলেন, বাবা কী বলতে চাইছেন। কথাগুলো অনুভব করতে তার

boierpathshala.blogspot.com

কষ্ট হয় না। বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাবতে শুরু করলেন—অমন সুন্দরী স্ত্রী তার, অমন মিষ্টি ব্যবহার! লাজুক নরম সরম মেয়ে। তার সামান্য নাকের ডাকটুকু নিয়ে সত্যিই কি সাতকাণ্ড রামায়ণ করার দরকার ছিল? এটুকু দোষ কি মেনে নিতে পারেন না তিনি?

অন্যদিকে বীণার তখন করুণ দশা। শাশুড়ি ঠাকরুন কানের কাছে মড়াকান্না জুড়েছেন, "ওরে, প্রথমদিনই আমার ছেলেটাকে ঘর ছাড়া করে ছাড়লে রে! একি সব্বোনেশে বউ! শেষকালে কি আমার দিবু দেশছাড়া হবে!"

সকলেই তার দুঃখে সমব্যথী হয়ে আহা... উঁহু করছিল। সঙ্গে অবধারিতভাবেই শাকের পাতে কাসুন্দির মতো দিবুর বউয়ের মুণ্ডুপাতও ছিল। ব্যতিক্রম শুধু রসি বামনি। তার জিভ বড় ধারালো। সে কটর কটর করে বলে, "তা'লে তো মা, অ্যাদ্দিনে বড় কত্তারও দেশত্যাগী হওয়ার কতা। তিনি তো কই হননি!"

এতক্ষণ এলিয়ে পড়ে হাপুশ নয়নে কাঁদছিলেন নারায়ণী। এবার সটান উঠে বসলেন, "কী বললি মুখপুড়ি! আমি নাক ডাকি!"

"এই ন্যাও!" রসি গা জ্বালানো হাসি হাসে, "ঠাকুরঘরে কে? না, আমি তো কলা খাইনে! আমি তোমার নাকের কথা কখন বললুম।"

"তাহলে কিসের কথা বললি!" নারায়ণী সব দুঃখ ভুলে গিয়ে তর্ক জুড়ে দিলেন। রীতিমতো ঝগড়া করে প্রমাণ করলেন যে, তার নাক আজন্মকাল কখনও ডাকেনি, আগেও ডাকত না, এখনও ডাকে না এবং ভবিষ্যতেও ডাকতেই পারে না।

গঙ্গার জল আর কতদূর গড়াত কে জানে। কিন্তু এর মধ্যেই দিব্যেন্দুর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। তাকে দেখে নারায়ণীর শোক ফের উথলে উঠতেই রসি বামনি এবারের মতো নিস্তার পেল।

দিব্যেন্দু মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করে শেষ পর্যন্ত ঘরে পাঠালেন। তার হস্তক্ষেপে ভিড়ও ফাঁকা হল। শূন্যঘরে মেঝের উপর 'থ' হয়ে বসেছিলেন বীণাপাণি। তার চুল বিস্রস্ত। চোখের জলে কাজল গলে গিয়ে মুখ কালো হয়ে গেছে। কুণ্ঠায়, লজ্জায় প্রায় মরে আছেন।

তিনি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করতে শুরু করলেন। স্ত্রী তখনও নতনয়না। কিন্তু দেখার বিষয় সেটা নয়। একটু এদিক ওদিক দেখতেই চোখে পড়ল, বীণার কোমরে একটা মস্ত কালশিটের দাগ!

"তোমার কোমরে ওই দাগটা কিসের?"

বীণা অপ্রস্তুত হয়ে আঁচল দিয়ে দাগ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন, "ও কিছু না।"

"কিছু না বলে তো মনে হচ্ছে না! কাল রাতেও তো ছিল না। তবে?"

তিনি একটু কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, "অন্ধকারে বুঝতে পারিনি। খাট থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছি।"

"অ।" দিব্যেন্দুর বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে সহধর্মিণী কীভাবে পড়েছেন। বাবার প্রতি সম্ভ্রম আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

"আমি... আমি...।" গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট থিরথির করে কেঁপে উঠল। তিনি দেখলেন একজোড়া বানভাসি অসহায় চোখ করুণ মিনতিতে তাকিয়ে আছে, "আমি আর কখনও নাক ডাকব না। সারারাত জেগে থাকব। বারান্দায় মাদুর পেতে শোবো... কিন্তু আপনি ঘর ছেড়ে যাবেন না। আপনার পায়ে পড়ি...।"

বীণাকে অবাক করে দিয়ে দিব্যেন্দু সজোরে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "ধু-উ-উ-স! কে বলল তুমি নাক ডাকো? তুমি মোটেই নাক ডাকো না।"

স্ত্রী হাঁ করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন। আস্তে আস্তে বললেন, "কিন্তু সবাই বলে যে...।"

"সবাই তো অনেক কথাই বলে। বলে, আমি নাকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লাথি, ঘুঁষি মারি। লোককে ধাক্কা মেরে বিছানা থেকে ফেলে দিই।" দিব্যেন্দুর চোখে কৌতুক, "কিন্তু তোমাকে কি ফেলে দিয়েছি?"

স্ত্রী চোখ নামিয়ে নিয়েছেন। বুকে চিবুক গুঁজে বললেন, "না।"

তিনি মুচকি মুচকি হাসছেন, "সুতরাং লোকের কথা সত্যি নয়। আমিও ঘুঁষোঘুঁষি করি না। তুমিও মোটেই নাক ডাকো না।"

এতক্ষণ বাদে বীণার মুখেও মৃদু হাসি ফুটল।

আস্তে আস্তে কেটে গেল কয়েক মাস। প্রথম প্রথম উঠতে বসতে বীণাকে শাশুড়ি পিসিশাশুড়ি ও অন্যান্য শাশুড়িদের কাছে প্রচুর খোঁচা হজম করতে হয়েছে। বিষয় সেই একই। নাক ডাকার খোঁটা! নারায়ণীর ভয় ছিল, এক'মাসে তার দিবু ঘুমোতে না পেরে হয় পাগল হয়ে যাবে, নয় কঙ্কালসার হতে হতে মারাই পড়বে। প্রত্যেকদিনই মনশ্চক্ষে দেখতেন, তার ছেলে রোগা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে দিব্যেন্দুর গায়ে গত্তি লাগল। ত্বকের চেকনাই বাড়ল। সব মিলিয়ে বেশ সুখী গৃহস্থ গৃহস্থ ভাব। নারায়ণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

বীণাপাণিও ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। শাশুড়ির মুখের উপর কথা বলেন না। নিশ্চুপে তাঁর সব ফরমায়েশ পূরণ করেন। তদুপরি রান্নার হাতটিও চমৎকার। মাস ছয়েকের মধ্যেই তার নাক ডাকার আওয়াজ চাপা পড়ে রান্নার স্বাদ ও সুগন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ছেলেবেলায় বীণার খুব গান গাওয়ার শখ ছিল। অর্থাভাবে শেখা হয়নি। কিন্তু শুনে শুনে গান তোলার অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারিণী হওয়ার দরুন বেশ কিছু গান পুঁজিতে ছিল। কণ্ঠস্বরটিও চমৎকার। অথচ তার এ গুণের কথা কাকপক্ষীতেও টের পায়নি। সম্বন্ধ করার সময়ে শ্বশুরমশাই রূপেই এমন কাত হয়েছিলেন যে, অন্য প্রসঙ্গ উঠতে পারেনি।

তাই অবসরে, নিভৃতে, কখনও বড়ি দিতে দিতে, কখনও বা আচার শুকোতে দেওয়ার সময়, ভিজে কাপড় ছাতে মেলবার ফাঁকে গুনগুন করে আপনমনেই গান গাইতেন তিনি। ভাবতেন, তার ওই নিভৃত সঙ্গীতচর্চা কেউ শুনছে না। অথচ একজন শুনে ফেললেন। দিব্যেন্দু হাওয়া খেতে বিকেলবেলায় ছাতে উঠেছিলেন। হঠাৎ একটা মিষ্টি স্বর কানে এল। রিনরিনে মধু ঝরা সুরেলা গলায় কে যেন গাইছে, 'আমার যা আছে, আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ।' শুনে চমৎকৃত হলেন। মুগ্ধ হলেন। তিনি নিজেও সঙ্গীতরসিক। এস্রাজ বাজাতে পারতেন। রাগসঙ্গীতের প্রতি অনুরাগও ছিল। অনেক জলসায় গিয়ে গান শুনেই

সকলেই আহা... উঁহু করছিল। অবধারিতভাবেই শাকের পাতে কাসুন্দির মতো দিবুর বউয়ের মুণ্ডুপাতও ছিল।

boierpathshala.blogspot.com

রেকর্ড শুনে সেইসব গান তুলে নেন। কর্মব্যস্ত দিনের পরে যখন শান্ত রাতের নিস্তব্ধতা নেমে আসে, তখন তাদের ঘরে সুর ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। কখনও বীণা গান ধরেন কখনও বা দিব্যেন্দু এস্রাজে ধরেন নানারকম রাগরাগিণীর রূপ। মালকোষ, দরবারি বাজিয়ে শোনান স্ত্রীকে। কলাশ্রী তার বড় প্রিয় রাগ। সে রাগের চলনও এস্রাজে ফুটে ওঠে। বীণার দেহে, মনে অজান্তেই কখন যেন রাগরূপগুলো আস্তে আস্তে বসে যায়। এরমধ্যে অবশ্য বীণাপাণির নাসিকাগর্জনের কোনও সুরাহা হয়নি। তার সব ভাল, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লেই আওয়াজের চোটে টেঁকা দায়। দিব্যেন্দু পিতৃবাক্য ভোলেননি। কিন্তু মানিয়ে নিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। প্রথমে চূড়ান্ত বিরক্ত লাগলেও আস্তে আস্তে একরকম গা সওয়া হয়ে এসেছে। বীণাপাণির অজস্র গুণের পাশে ওইটুকু দোষ নিতান্তই তুচ্ছ। অথচ ওই সামান্য দোষটাও বেশিদিন দোষ থাকল না!

একরাতে বীণা ক্লান্ত হয়ে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তার নাকের ডাকে কড়ি বরগা রীতিমতো কাঁপছে। দিব্যেন্দু এপাশ ওপাশ করছেন। কানের উপর কোল-বালিশ চেপে একবার একশো থেকে উলটো গুনছেন, কখনও ভেড়া গোনার চেষ্টা করছেন। শত চেষ্টাতেও ঘুম আসছে না! এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎই এক অভাবনীয় আবিষ্কার করে বসলেন তিনি! আকস্মিকভাবেই তার মনে হল বীণা মন্দ্রসপ্তকে নাক ডাকছেন। কৌতূহলী হয়ে তার নাকের ডাক অনুসরণ করলেন। পরক্ষণেই মনে হল আওয়াজটা যেন রেখাব, গান্ধার ছুঁইছুঁই করতে করতে ফের মন্দ্রের সা তে এসে দাঁড়িয়ে গেল। বেশ কয়েকবার এমন চলতে চলতে হঠাৎই সটান তার সপ্তকের সপ্তমে!

দিব্যেন্দু নিজের অজান্তেই প্রায় হাততালি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। কোনওমতে সামলে নিলেন। এরকম তানকর্তব কোনও ওস্তাদও সহজে করতে পারে না! তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও আবিষ্কার করলেন রাত কাটিয়েছেন। কিন্তু নিজের বাড়িতেই এমন মূল্যবান সম্পদ লুকিয়ে আছে তা ভাবতেও পারেননি। অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে এতটাই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, সটান মায়ের কাছে এসে প্রস্তাব পেশ করলেন, "এ বছরের দুর্গোৎসবের জলসায় বীণার গানের একটা আসর হবে।" ঘরভর্তি শাশুড়ির দল হাঁ হাঁ করে উঠল। নারায়ণী প্রায় তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন, "কী! ঘরের বউ রং মেখে সং সেজে আসরে নামবে! গা ঢেলে পরপুরুষের সামনে গান গাইবে! অসম্ভব! গান বাইজিরা গায়। ঘরের বউরা নয়।"

এবার মায়ের উপরে বিরক্ত হলেন দিব্যেন্দু। কী আশ্চর্য! এই খিটকেলে বুড়িদের জ্বালায় কি ঘরের বউয়ের গানও শোনার উপায় নেই?

তারপরই মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি এল। এস্রাজটা নিয়ে এলেন শোবার ঘরে। অনেক রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, দরজা বন্ধ করে স্ত্রীকে বললেন, "বীণা, গান শোনাবে?" বীণা রোমাঞ্চিত হলেন। সেই সঙ্গে ভয়ও লাগল, "যদি কেউ শুনে ফেলে?"

"শুনলে শুনবে।" দিব্যেন্দু এস্রাজটা কোলের উপর টেনে এনেছেন, "পরপুরুষের সামনে তো গাইছ না। তুমি গাইবে। আমি বাজাবো।" এস্রাজের উপর ছড় টেনে বললেন, "গাও।"

বীণা সলজ্জ ভঙ্গিতে গান ধরলেন, 'আমারো পরাণ যাহা চায়..., তুমি তাই...।'

সেই শুরু। তারপর থেকেই দুই মুগ্ধ হৃদয়ের নিভৃত আসর রোজ বসে। গায়িকা বীণা। শ্রোতা ও সঙ্গতকারী একমেবাদ্বিতীয়ম দিব্যেন্দু। নারায়ণী জানতে পেরে জগঝম্প করলেও পূর্ণেন্দু ব্যাপারটাকে যুক্তি দিয়ে সহজ করে দিলেন। বললেন, "পরপুরুষের সামনে তো গাইছে না! তোমার ছেলের গান শোনার শখ হয়েছে। সে নিজের ঘরের বউয়ের গান শুনে শখ মেটাতে পারে, অথবা বাইজিবাড়ি গিয়ে পড়েও থাকতে পারে। কোনটা বেশি ভাল?"

নারায়ণী এর কোনও জুতসই জবাব দিতে পারলেন না। ফলস্বরূপ গানের আসর নির্বিঘ্নেই চলতে থাকল। বীণাপাণির জন্য দিব্যেন্দু নানারকম গানের গ্রামাফোনের রেকর্ড কিনে আনেন। বীণা অবলীলায়

> বীণা রেকর্ড শুনে গান তুলে নেন। কর্মব্যস্ত দিনের পরে যখন রাত নেমে আসে, তখন ঘরে সুর উড়ে বেড়ায়। কখনও বীণা গান ধরেন কখনও বা দিব্যেন্দু এস্রাজে ধরেন রাগরাগিণীর রূপ।

boierpathshala.blogspot.com

যে, নাকের ডাকের মধ্যেই আলগোছে কত রাগ খেলা করছে! কখনও যেন মেঘমল্লার, কখনও দরবারি। আবার কখনও সব ভেঙে দিয়ে মারুবেহাগ। বাঃ! ভারী মজা তো! উত্তেজনায় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল এই আবিষ্কারটা আগে করেননি কেন! নিজের আশ্চর্য আবিষ্কারের আনন্দে, রাগরূপ খুঁজতে খুঁজতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

বলাইবাহুল্য—চমৎকার ঘুম হল!

এই অজানা আবিষ্কারের কথা কেউ জানল না, বীণাও নন। কিন্তু এর মাসখানেক পর স্ত্রী বাপের বাড়ি গেলে মহাবিপদ হল দিব্যেন্দুর। রাতে একা বিছানায় শুয়ে ছটফট করেন। কারুর কোনও সাড়া নেই। নেই একটা নরম, কোমল শরীর। নেই প্রলয়ঙ্করী নাসিকাগর্জন! অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ঘুমোতে পারলেন না। একটা একটা করে দিন যায়, আর অনিদ্রায় কাহিল হয়ে পড়েন তিনি।

বন্ধুদের কাছে শুনেছিলেন বউয়েরা বাপের বাড়ি গেলে নাকি স্বামীদেবতার পোয়াবারো। গোটা খাটটা দিব্যি একলা দখল করে শোওয়া যায়। সকালবেলা কেউ 'ওঠো... ওঠো' বলে উৎপাত করবে না। অযথা তাড়া দেওয়ার কেউ নেই, ঝগড়া করার কেউ নেই। শান্তিময় জীবন। কিন্তু নিজে সেই শান্তির বিন্দুমাত্রও অনুভব করতে পারলেন না। বরং উলটে মনে হতে লাগল—এত শান্তি কেন! রাত এত নিস্তব্ধ কেন হবে? চতুর্দিকে কি কোনও শোরগোল থকতে নেই! ভাবতে ভাবতেই রাগ হতে লাগল। রাগ থেকে হতাশা। হতাশা থেকে চোখের তলায় কালির পোঁচ। অবস্থা দেখে ফের কান্না জুড়লেন নারায়ণী, "আমার সোনার চাঁদ ছেলেটার কি অবস্থা হল! চাঁদ মুখে দাড়ি গজিয়েছে, চোখ লাল, নির্ঘাত কেউ নজর দিয়েছে।" বলতে বলতেই হাতে এক খাবল ছাই ভস্ম নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, ছেলের মাথা ঝেড়েঝুড়ে, রুদ্রাক্ষের মালা ও মাদুলি পরিয়ে, কোন বাবার চরণামৃত খাইয়ে একশা করলেন। আর পূর্ণেন্দু গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসলেন। বললেন, "বউমাকে আনার ব্যবস্থা করো।"

অবশেষে দিব্যেন্দুর যন্ত্রণার উপশম হল। বীণা লজ্জিতমুখে ফিরে এলেন। বাপের বাড়িতে তখন রাষ্ট্র হয়ে গেছে, জামাই মেয়েকে ছাড়া থাকতে পারে না। সেই গৌরব বুকে নিয়ে নিজের ঘরে গুটিগুটি ঢুকলেন। দিব্যেন্দু তখন আরামকেদারায় বসে ঢুলছিলেন। বউকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললেন, "এসেছ! বাঁচালে! এখন একটু ঘুমোও দেখি।"

প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন বীণাপাণি। এখন দুপুর বারোটাও বাজেনি! এই সময়ে কি ঘরের বউ ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারে, না ঘুমোলে চলে! হেঁশেলে এখনও ঊনকোটি কাজ।

"সে সব পরে হবে।" পতিদেবতা দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, "অনেকটা পথ কষ্ট করে এসেছ। একটু ঘুমিয়ে নাও। পরে কাজ কোরো।"

ছেলের ঘরের দরজা অসময়ে বন্ধ হতে নারায়ণী মুখ ভেঁটকে বললেন, "আদিখ্যেতা!"

পিসিশাশুড়ি বললেন, "দিবুটা লজ্জার মাথা খেয়েছে। আমরা কি বিয়ে করিনি? না আমাদের বর ছিল না!"

রসি বামনি দাঁতে নস্যি গুঁজতে গুঁজতে বলল, "বেশ হয়েছে।"

যেই যা বলুক, বীণাপাণিকে সেদিন অসময়ে ঘুমোতেই হল। 'ফুর... ফুর... ফুরুৎ... ঘরুর... ঘুরুৎ' শব্দে নাক ডাকা শুরু হতেই যেন কানের কাছে রামকেলি, ভূপালির পাহাড় ভেঙে পড়ল। আঃ, কী শান্তি! পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন দিব্যেন্দু। চোখের তলার কালি বিলুপ্ত হতে একদিন-একরাতের বেশি সময় লাগল না। তিনি ভেবেছিলেন, এ তার আবিষ্কারের সুফল। আসলে সে আবিষ্কারের আসল ফর্মুলার নাম ভালবাসা!

বন্ধুদের কাছে শুনেছিলেন বউয়েরা বাপের বাড়ি গেলে স্বামীর পোয়াবারো। খাটটা একলা দখল করা যায়।

"আমার কাছে থাকবি দিদুভাই? তাহলে অনেক গল্প বলব। রাক্ষসের গল্প, রাজার গল্প, ভূত-পরির গল্প...।"

"না-আ-আ! তোমার কাছে থাকব না—মা বলে, তুমি বড্ড নাক ডাকো।"

উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একজোড়া বলিরেখাকুঞ্চিত চোখ সাগ্রহে তাকিয়েছিল নাতনির দিকে। জবাব শুনে যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল।

এরমধ্যে কেটে গেছে পঁয়তাল্লিশ বছর। পূর্ণেন্দু ও নারায়ণী দেহ রেখেছেন। তবে যাওয়ার আগে দেখে গেছেন, তাঁদের দিবু দুঁদে উকিল হয়েছেন। বীণা সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে দশ হাতে সংসার সামলাচ্ছেন। বাগানে, ফোয়ারার পাশে, পরির চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাদের সন্তান খেলে বেড়াচ্ছে। অজয়কে পিঠে নিয়ে কতদিন যে পূর্ণেন্দু 'ঘোড়া ঘোড়া' খেলেছেন তার হিসেব নেই। রাতে ঠাকুমার কাছে ভূতের গল্প না শুনলে নাতির ঘুমই হত না!

শেষপর্যন্ত বউয়ের হাতের সেবা, নাতি ও ছেলের হাতের জল পেয়ে শান্তিতে একে একে দু'জনেই চোখ বুজলেন। তারপর সাঁৎ সাঁৎ করে কেটে গেল বছরগুলো। অজয় বড় হল। পড়াশোনা শেষ করে মস্ত ইঞ্জিনিয়ার হল। চাকরি করল। চার বছর প্রেম করার পর সহকর্মিণীকে সহধর্মিণী করে ঘরে আনল। এবং মাস দুয়েকের মধ্যেই নিজেদের শরিকি বাড়ি ছেড়ে আলাদা ফ্ল্যাটে উঠে গেল।

এই সময়ের মধ্যে দিব্যেন্দু ও বীণা কখনও একদিনের জন্যেও আলাদা থাকেননি। জোড়া পায়রার মতো ছিল তাদের দাম্পত্যজীবন। যৌন-আকাঙ্ক্ষা চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু তাদের জীবনে তারপরও কিছু ছিল, যা একরাতের জন্যও দু'জনকে আলাদা করতে পারেনি।

অজয়ের প্রেমিকা থাকাকালীন মঞ্জীরা মুখ টিপে হেসে বলেছিল, "এই বয়েসেও! তোমার বাবার ক্ষমতা আছে।"

অজয় আহত হয়ে বলে, "আমার বাবা-মায়ের সম্পর্কের কেমিস্ট্রি তুমি বুঝবে না। ক্ষমতাই শেষ কথা নয়।" মঞ্জীরা বোঝেনি। অজয়ও কি বুঝেছে? নয়তো মায়ের সামান্য নাক ডাকাকে ইস্যু করে সম্পর্কে ভাঙন ধরল কেন? বাবার অদ্ভুত গোঁড়ামি। মঞ্জীরারও হয়তো বাড়াবাড়ি ছিল। পাশের ঘরে মা নাক ডাকলে তার ঘুম হত না। এ ক'বছরে বীণা বহরে বেড়েছেন। বেড়েছে আওয়াজের বহরও। তার উপর শরিকি বাড়ি হওয়ার দরুন অন্য ঘরে শিফট হওয়ার সুবিধেও ছিল না। দিনের পর দিন নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

অবশেষে সে বলেই ফেলল, "মায়ের নাক ডাকার কিছু করো। নয়তো আমি বাঁচব না।"
স্বাভাবিক! মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চোদ্দো থেকে ষোলো ঘণ্টা পরিশ্রম করার পর রাতে ঘুমটা চৌপাট হয়ে গেলে কারই বা মাথার ঠিক থাকে! বাবাকে সে কথা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল অজয়। বলল, "বাবা, এখন নাক ডাকার অনেক রকম ট্রিটমেন্ট আছে। মায়ের এই প্রবলেমটা...।" দিব্যেন্দু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, "তুই কি তোর মাকে প্রবলেম বলে মনে করিস?"
"তা নয়," সে অপ্রস্তুত, "কিন্তু মঞ্জীরার কথাটাও ভাবো। ভোর পাঁচটায় উঠে আমাদের ব্রেকফাস্ট-টিফিন, সব তো ওকেই রেডি করতে হয়। মা তো এই বয়েসে পারেন না। তারপর সারাদিন অফিসের চাপ। রাতে যদি মায়ের নাক ডাকার জন্য ঘুমোতে না পারে...।"
দিব্যেন্দু গম্ভীরস্বরে সংযত গলায় বললেন, "তোর মায়ের সঙ্গে আমি প্রায় সারাজীবন কাটিয়ে এলাম। আমার তো কোনও অসুবিধে হয়নি।" অধৈর্য হয়েছিল অজয়, "তোমার অসুবিধে হয়নি বলে কারুর কি হবে না বাবা? আমারও তো মাঝেমধ্যে সমস্যা হয়। আর মঞ্জীরা তো...।"
"সেটা তোদের প্রবলেম।"

বাবার মতো যুক্তিবাদী মানুষ কেন যে অন্যায় জেদ আঁকড়ে বসে থাকলেন! মঞ্জীরার প্রাণরক্ষার্থে অজয়কে অন্যত্র যেতেই হল। মঞ্জীরার বাবা মেয়ের নামে ফ্ল্যাট আগেই কিনে রেখেছিলেন।

বাবার কি অদ্ভুত একগুঁয়েমি! অজয়ের এবার মেজাজ চড়ে, "তবু তুমি মানবে না যে মা-র ভয়াবহ নাক ডাকে!"
দিব্যেন্দু কেটে কেটে বললেন, "তোমার মা নাক ডাকেন না।" আশ্চর্য! এ কী জাতীয় মনোভাব? চোখ বুজে সূর্যকে অস্বীকার করার মতো নিরেট বোকামি! বাবার মতো যুক্তিবাদী মানুষ কেন যে বাচ্চাছেলের মতো অন্যায় জেদ আঁকড়ে বসে থাকলেন কে জানে। ফলস্বরূপ মঞ্জীরার প্রাণরক্ষার্থে অজয়কে অন্যত্র যেতেই হল। মঞ্জীরার বাবা বনেদি লোক। মেয়ের নামে একটা ফ্ল্যাট আগেই কিনে রেখেছিলেন। তাই কোনও সমস্যা হয়নি। অজয়রা বাড়ি ছেড়ে চলে আসার দিন বীণা চোখের জল ফেলেছেন। স্বামীকে বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। দিব্যেন্দু বোঝেননি। তার বক্তব্য, "সারা শৈশব, যৌবন যার সঙ্গে কাটিয়ে ওর কোনও সমস্যা হয়নি, বিয়ে করার পর সেই লোকটাই যখন মেন প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়—তখন বুঝতে হবে ছেলে মায়া কাটিয়েছে। মায়া করে লাভ নেই বীণা।"
"কিন্তু ও তো অন্যায় কিছু বলেনি।" বীণা কেঁদে ফেলেছেন, "সত্যিই তো আমি...।"
"না। নাক ডাকো না।" তার চোয়াল শক্ত হয়, "যদি ডাকো সে সমস্যা আমার। আমি তোমার পাশে শুই। অজয়ের বউ নয়। ওর নালিশ করার অধিকার নেই।"
বীণা আর কিছু বলতে পারেননি। মনের ব্যথা মনেই চেপে রেখেছিলেন। অব্যক্ত অপরাধবোধ তার নিজের মনেই গুমরে মরতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দেহ মন ক্রমাগতই অবসাদগ্রস্ত হয়ে এল। বেশ কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দিব্যেন্দু চিকিৎসার ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হল না। ডাক্তাররা বললেন, "ওঁর দেহে রোগ নেই। সবই বার্ধক্যজনিত সমস্যা ও মানসিক অবসাদ।"
কেটে গেল আরও পাঁচবছর। এর মধ্যে অজয়ের একটি কন্যাসন্তান জন্মেছে। সে খবর জানিয়েছে সে। কিন্তু মেয়ে নিয়ে একবারও আসেনি। দেখা করতে অজয় সবসময় একাই আসে। মঞ্জীরা বা তার মেয়ে—কেউ আসে না। সে কথা গভীরভাবে দু'জনের বুকেই বেজেছিল। দিব্যেন্দু সামলে নিলেন। বীণা পারলেন না। একদিন সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন বীণাপাণি। ডাক্তার অবস্থা দেখে মাথা নেড়ে বললেন, "গতিক ভাল বুঝছি না। হসপিটালাইজড করা দরকার।"
বীণার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তবু 'হসপিটাল' শুনে আঁতকে ওঠেন। সভয়ে বললেন, "না... আমি যাব না। ...ওগো, আমায় কোথাও পাঠিও না...।"
"না। তুমি যাবে না বীণা। কোথাও যাবে না।" স্ত্রীর হাত সস্নেহ চেপে ধরেন তিনি, "এখানেই থাকবে। আমার সঙ্গে।"
বীণা হাসপাতালে গেলেন না। তার ঘরটাই হয়ে উঠল হাসপাতালের আই.সি.ইউ। সকালে, বিকেলে ডাক্তার ভিজিট করে যায়। দু' বেলার নার্স আছে। আছে অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি ও মেডিসিন।

boierpathshala.blogspot.com

এমনকী বীণার যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য ঘরে এ.সিও বসালেন দিব্যেন্দু।
তবু মনে হয়, স্ত্রীর কষ্ট, যন্ত্রণা যদি নিজের দেহে নিতে পারতেন! ডাক্তার যখন সূঁচ ফোটায় তখন তিনি চোখ বুঁজে থাকেন। যখন শ্বাসকষ্ট হয়, তখন ভাবেন নিজের ভাগের অক্সিজেনটুকুও কি অক্সিজেন সিলিন্ডারে ভরে দেওয়া যায় না! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন তার কোনও অযত্ন হচ্ছে কি না। সূঁচ ফোটানোর দাগ, একাধিক চ্যানেলের কালশিটে দেখে যন্ত্রণায় চোখে জল আসে। তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। বীণাপাণি তাকে দেখলে খুশি হন। কখনও ভাবেন যে, শুয়ে থেকে স্বামীর অসুবিধে করছেন। আজকাল চোখে ঠিকমতো দেখতেও পান না। তবু স্বামীর মুখে হাত বুলিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চান, "হ্যাঁগো, দাড়ি কাটোনি কেন? শরীর খারাপ হয়নি তো?"
খবর পেয়ে অজয় ছুটে এল। সঙ্গে মঞ্জীরা ও তার চারবছরের মেয়ে।
বীণাপাণি এই প্রথম নাতনিকে দেখলেন। তার মুখে হাসি ফুটল। বাঃ, দিব্যি টরটরে হয়েছে তো। ছোট্ট পুতুলটার মতো। মুখটা একদম অজয়ের ছোট সংস্করণ। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। তখনও তার কথা বলার শক্তি ছিল। কোনওমতে কুণ্ঠিত হেসে অতিকষ্টে বললেন, "আমার কাছে থাকবি দিদুভাই? তাহলে অনেক গল্প বলব। রাক্ষসের গল্প, রাজার গল্প, ভূত-পরির গল্প...।" কথাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত লোভ ছিল। কচি হাতের স্পর্শ পাওয়ার লোভ। ফুলের মতো ছোট্ট মানুষের একটু সান্নিধ্য পাওয়ার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা।
কিন্তু কচি মেয়েটা যা উত্তর দিল তাতে কুণ্ঠার অবধি রইল না তার। দিব্যেন্দু মঞ্জীরাকে ডেকে নিয়ে শান্তস্বরে বলেন, "আমাদের বয়েস হয়েছে বউমা। এখন সুখ না দিতে পারো, যন্ত্রণা দিও না।"
অজয় বুঝল মঞ্জীরা আর দ্বিতীয়বার এ বাড়িতে আসবে না। কিন্তু মায়ের অবস্থা দেখে তার বিবেকদংশন হয়েছিল। সে বলল, "মঞ্জীরারা ফিরে যাক বাবা। আমি থেকে যাই। মায়ের যা পজিশন, তাতে তোমার পক্ষে একা দৌড়োদৌড়ি করা সম্ভব নয়। আমি থাকলে চাপটা কমবে।"
দিব্যেন্দু আবার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন। একটা ইচ্ছে হয়তো তার নিজেরও ছিল। স্খলিত স্বরে বলেন, "যা ভাল বুঝিস।"
তারপর থেকে অজয় এ বাড়িতেই থেকে গেছে। আর প্রতি রাতে বাবার পদশব্দ শুনছে। কি অদ্ভুত ভয় বাবার! প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এসে কান পেতে শোনেন মায়ের নাক ডাকছে কি না! ওই একটা অমোঘ শব্দই যেন বহন করে সব অস্তিত্ব! ওই একটা শব্দের উপরই নির্ভরশীল সমস্ত জীবন! নাক নয়, যেন জীবন তাকে ডেকে চলেছে প্রতিনিয়ত। সেই ডাকের জন্যই রাতে জেগে থাকেন বৃদ্ধ। আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাকেন, "বাবু, জেগে আছিস?" তুমি যেতে পারো না! ....তুমি এভাবে থেমে যেতে পারো না বীণাপাণি।
ফুলশয্যার দিন থেকে আজ পর্যন্ত— কখনও এমন নীরব হওনি! দিন পনেরো আগেই কথা বলা বন্ধ হয়েছিল। তবু আমায় ডেকেছ। আমি সে অমোঘ ডাকে সাড়া দিয়ে গেছি। আর কেউ সে ডাক বোঝেনি। কেউ সহ্য করেনি। কিন্তু আমি করেছি। তোমার ডাকের সঙ্গে আমার জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। আজ সে বন্ধন ছিঁড়ে তুমি হঠাৎ থেমে যেতে পারে না। ...তুমি যেতে পারো না...।
যখন অজয়রা বীণাপাণিকে নিয়ে শ্মশানের দিকে চলে গেল তখনও চুপ করে বসেছিলেন দিব্যেন্দু। কোনও বোধই তার মধ্যে কাজ করছে না। শুধু শূন্য ঘরটার দিকে ফ্যালফ্যালে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। নেই! ...কোথাও নেই? তার অন্তর্যামী জানেন যে, দিব্যেন্দু এখনও বিশ্বাস করেন না—বীণাপাণি নেই! পনেরো দিন আগেই কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আজ সকালেই বাড়াবাড়ি হল। কিছু করার আগেই সব শেষ। ম্যাসিভ হার্ট ফেলিওর।
ডাক্তারি সার্টিফিকেটটা এক ঝলক দেখে চোখ সরিয়ে নিয়েছেন দিব্যেন্দু।
অক্ষরগুলো যেন পতঙ্গ হয়ে নাচানাচি করছিল। কিছু বুঝতে পারেননি। শুধু একদৃষ্টে বীণার প্রশান্ত, স্থির মুখের দিকে তাকিয়ে ভেবেছেন—ও কি ঘুমোচ্ছে? অন্যদিনের মতো শব্দ করছে না কেন? তবে কি জেগে থেকে দুষ্টুমি করছে? ঘুমের ভান করে পড়ে আছে?
আস্তে আস্তে ডেকেছিলেন, "বীণা...! ...বীণাপাণি....।"
মনে ক্ষীণ আশা ছিল, বীণা চোখ মেলে তাকাবেন। খিলখিল করে হেসে উঠে বলবেন, "কী করে বুঝলে জেগে আছি?" দিব্যেন্দু মুখ টিপে হেসে উত্তর দেবেন, "আমি বুঝতে পারি।" কিন্তু আজ তাকে নিরাশ করে বীণাপাণি এই প্রথম কোনও উত্তর দিলেন না। একরাশ বৃষ্টিভেজা হাওয়া তাকে ছুঁয়ে গেল। দিব্যেন্দু স্তম্ভিত হয়ে বসে ভাবছিলেন, "তাহলে কী হল? বীণা থেমে গেল? অভিমানে থেমে গেল? কী এমন ত্রুটি হল যে আর তাকে ডাকল না? অথবা ডেকেছে, তিনি শুনতে পাননি! আঁ?
আপনমনে ভাবতে ভাবতেই আচমকা কানে এল একটা ঘড়ঘড় শব্দ! ক্ষীণ ...কিন্তু স্পষ্ট! তড়িদাহতের মতো উঠে দাঁড়ালেন তিনি! ও কি! কিসের আওয়াজ! কোথা থেকে আসছে!
আজও বাইরে পরিটা একা একা ভিজছিল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি তার চোখমুখ চুঁইয়ে পড়ছে। ফোয়ারার বহুদিনের পুরনো পাম্পের মোটরটা সম্ভবত নষ্ট হয়ে গেছে। তারই ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছে বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে! কিন্তু সত্যিই কি মোটরের আওয়াজ? না অন্য কিছু? দিব্যেন্দু পড়িমড়ি করে ছুটে গেলেন পরিটার কাছে। কান পাতলেন তার ক্ষয়ে যাওয়া বুকে! পরির পাথুরে বুক থেকেই উঠে আসছে শব্দটা! একটা অবিশ্রান্ত—ঘড়ঘড়! গম্ভীর অশান্ত নিনাদ! বৃষ্টিতে আপাদমস্তক ভিজে গেছেন। তবু দু' হাতে পরিটাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। আঃ! এই তো! এই তো সেই মেঘমল্লার! এই তো সেই দরবারি—মারুবেহাগ! এই তো! বীণা তাকে ডাকছে! সেই ঘড়ঘড়-ঘড়ঘড়ের সঙ্গে মিলল তার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক। পরম শান্তিতে চোখ বুঁজলেন দিব্যেন্দু। নাঃ, বীণা থামেনি। থামতে পারে না। যতদিন দিব্যেন্দুর হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে ততদিন থামবে না সে। অবিরাম ডেকেই যাবে। ডেকে যাবে আমৃত্যু। বীণার ডাক অমোঘ! ...সে ডাক থামবে না। থামবে না কোনওদিন। সে অমোঘ...! সে অমোঘ!

বীণাপাণি প্রথম নাতনিকে দেখলেন। মুখে হাসি ফুটল। বাঃ, দিব্যি টরটরে হয়েছে তো। ছোট্ট পুতুলটার মতো।

অলঙ্করণ: দেবাশিস দেব

boierpathshala.blogspot.com